স্পটলাইট

ছোটনাগপুরের এই ছোট্ট শহরটায় পুজোর ছুটি কাটাতে আমরা আগেও অনেক-বার এসেছি। আরো বাঙালীরা আসে; কেউ কেউ নিজেদের বাড়িতে থাকে, কেউ কেউ বাড়ি-বাংলো-হোটেল ভাড়া করে থাকে, দিন দশেকে অন্তত মাস ছয়েক আয়ু বাড়িয়ে নিয়ে আবার যে-যার জায়গায় ফিরে যায়। বাবা বলেন, 'আজকাল আর খাবার-দাবার আগের মতো সস্তা নেই ঠিকই, কিন্তু জলবায়ুটা ত ফ্রী, আরে সেটার কোয়ালিটি যে পড়ে গেছে সে কথা ত কেউ বলতে পারবে না।'

দলে ভারী হয়ে আসি, তাই গাড়ি-ঘোড়া সিনেমা-থিয়েটার দোকান-পাট না থাকলেও দশটা দিন দারুণ ফুর্তিতে কেটে যায়। একটা বছরের ছুটির সঙ্গে আরেকটা বছরের ছুটির তফাত কী জিগ্যেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে, কারণ চারবেলা খাওয়া এক—সেই মুরগী মাংস ডিম অড়হর ডাল, বাড়িতে দোওয়া গরুর দুধ, বাড়ির গাছের জামরুল পেয়ারা; দিনের রুটিন এক—রাত দশটায় ঘুম, ভোর ছটায় ওঠা, দুপুরে তাস মোনপলি, বিকেলে চায়ের পর রাজা পাহাড় অবধি ইভনিং ওয়ক্; অন্তত একদিন কালীঝোরার ধারে পিকনিক; দিনে ঝলমলে রোদ আর তুলো পেঁজা মেঘ; রাত্তিরের আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা ছড়ানো ছায়াপথ, কাক শালিক কাঠবেড়াল গুবরে ভোমরা গিরগিটি কাঁচপোকা কুঁচফল—সব এক।

কিন্তু এবার নয়।

এবার একটা তফাত হল।

অংশুমান চ্যাটার্জিকে আমার তেমন ভালো না লাগলে কী হল—সে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিল্মস্টার। আমার ছোট বোন শর্মি—বারো বছর বয়স—তার একটা পুরো বড় বঙ্গলিপি খাতা ভরিয়ে ফেলেছে ফিল্ম পত্রিকা থেকে কাটা অংশুমান চ্যাটার্জির ছবি দিয়ে। আমার ক্লাসের ছেলে-দের মধ্যেও তার 'ফ্যান'-এর অভাব নেই। এর মধ্যেই তারা অংশুমানের চুলের স্টাইল নকল করছে, ওর মতো ভারী গলায় ভুরু তুলে কথা বলার চেষ্টা করে, শার্টের নিচে গেঞ্জি পরে না, ওপরের তিনটে বোতাম খোলা রাখে।

সেই অংশুমান চ্যাটার্জি সঙ্গে তিনজন চামচা নিয়ে কুন্ডুদের বাড়ি ভাড়া করে ছুটি কাটাতে এসেছে এই শহরে, সঙ্গে পোলারাইজড কাঁচের জানালাওয়ালা এয়ার কন্ডিশন্ড হল্দে মার্সেডিজ গাড়ি। সেবার আন্দামান যাবার সময় দেখে-ছিলাম আমাদের জাহাজ ঢেউ তুলে চলেছে আর আশেপাশের ছোট নৌকাগুলো সেই ঢেউয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। অংশুমান-জাহাজ বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোলে এখানকার পান্সে-নৌকো বাঙালী চেঞ্জারদের সেই রকম অবস্থা হয়—ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ যায় না। মোটকথা এই একরত্তি শহরে এরকম

ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। ছোটমামা ছবি-টবি দেখেন না। শখ হল পামিস্ট্রির, তিনি বললেন, 'ছেলেটার যশের রেখাটা একবার দেখে আসতে হচ্ছে। এ সুযোগ কলকাতায় আসবে না।' মা-র অবিশ্যি ইচ্ছে অংশুমানকে একদিন ডেকে খাওয়ানোর। শর্মিকে বললেন, 'হাঁরে, তোরা ত ফিলিমের ম্যাগাজিনে ওর বিষয় এত সব পড়িস-টড়িস—ও কী খেতে ভালোবাসে জানিস?' শর্মি মুখস্থ আউড়ে গেল—'কৈ মাছ, সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ, কচি পাঠার ঝোল, তন্দুরি চিকেন, মুসুরির ডাল, আমের মোরব্বা, ভাপা দই—তবে সবচেয়ে বেশি ভালো-বাসে চাইনিজ।' মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা বললেন, 'খেতে বলতে ত আপত্তি নেই। হয়ত বললে আসবেও, তবে সঙ্গের ওই মোসাহেবগুলো...'

ছোনিদা আমার খুড়তুতো ভাই। সে সাংবাদিক, খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে, ছুটি প্রায় পায় না বললেই চলে। এবার এসেছে ঝিকুড়িতে সাঁওতাল-দের একটা পরব হয় এই সময়, সেই নিয়ে একটা ফীচার লিখতে। সে বলল এই ফাঁকে অংশুমানের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের সুযোগ তাকে নিতেই হবে। 'লোকটা বছরে তিনশো সাতষট্টি দিন শুটিং করে; ছুটির মওকা কি করে পেল সেটাই ত একটা স্টোরি।'

একমাত্র ছোটদারই কোনো তাপ উত্তাপ নেই। ও প্রেসিডেন্সিতে পড়া ভয়ংকর সিরিয়াস ছেলে। ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার, জার্মান সুইডিশ ফরাসী কিউবান ব্রেজিলিয়ান ছবি দেখে, বাংলা ছবি নিয়ে একটা কড়া থীসিস লিখবে বলে ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করছে। অংশুমানের 'বিনিদ্র রজনী' ছবি টেলিভিশনে তিন মিনিট দেখে 'ডিসগ্যাসটিং' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয় এবারের ছুটিটাই মাটি; ফিল্ম স্টার এসে এমন সুন্দর চেঞ্জের জায়গার আবহাওয়াটা নষ্টই করে দিয়েছে।

যারা চেঞ্জে আসে তারা ছাড়াও বাঙালী এখানে দু'চার জন আছে যাঁরা এখানেই থাকেন। তার মধ্যে গোপেনবাবু একজন। একটা ছোট্ট বাড়ি করে আছেন এখানে বাইশ বছর, চাষের জমিও নাকি আছে কিছু। বয়স বোধ হয় বাবার চেয়ে বছর পাঁচেকের বেশি, রসিক মানুষ, উনি এলেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে যায়।

আমরা পৌঁছানর দুদিন পরেই ভদ্রলোক সকালে এসে হাজির, খদ্দরের পাঞ্জাবীর সঙ্গে মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাতে বাঁকানো লাঠি আর পায়ে ব্রাউন কেডস জুতো। বাংলোর বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন ভদ্রলোক—'চৌধুরী সাহেব আছেন নাকি?'

আমরা চা খাচ্ছিলাম, বাবা ভদ্রলোককে ডেকে এনে বসালেন আমাদের সঙ্গে।

'ওরে বাবা, এ যে দেখছি এলাহি কারবার!' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি কিন্তু শুধু এক কাপ চা।'

গতবারে ভদ্রলোকের চোখে ছানি ছিল, বললেন মার্চ মাসে কলকাতায় গিয়ে কাটিয়ে এসেছেন।—'দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'এবার ত এখানে রমরমা ব্যাপার মশাই,' বললেন বাবা।

'কেন?' ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেছে।

বাবা বললেন, 'সে কি মশাই, তারার হাট বসে গেছে এখানে, আর আপনি জানেন না?'

'তার মানে আপনার দৃষ্টি এখনো ফরসা হয়নি,' বললেন ছোটমামা, 'এত বড়

ফিল্ম স্টার এসে রয়েছে এখানে, শহরে হৈ হৈ পড়ে গেছে, আর আপনি সে খবর রাখেন না?'

'ফিল্ম স্টার?' গোপেনবাবুর ভুরু এখনো কুঁচকোন। 'ফিল্ম স্টার নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে মশাই? ফিল্ম স্টার মানে ত শুটিং স্টার। তারা ত শুটিং করে শুনেছি। শুটিং স্টার জান ত, সুমোহন?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন গোপেনবাবু—'আজকে আছে, কালকে নেই। ফস্ করে খসে পড়বে আকাশ থেকে আর বায়ুমণ্ডলে যেই প্রবেশ করল অমনি পুড়ে ছাই। তখন পাত্তাই পাওয়া যাবে না তার।'

ছোটদার একটা ছোট্ট চাপা কাশিতে বুঝলাম গোপেনবাবুর কথাটা তার মনে ধরেছে।

'আসল স্টারের খবরটা তাহলে পৌঁছয়নি আপনাদের কাছে?' গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করলেন গোপেনবাবু।

'আসল স্টার?'

প্রশ্নটা করলেন বাবা, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি গোপেনবাবুর দিকে, সকলেরই মনে এক প্রশ্ন।

'গির্জার পিছনদিকে কলুটোলার চাটুজ্যেদের একটা বাগানওয়ালা একতলা বাড়ি আছে দেখেছেন ত? সেইখেনে এসে রয়েছেন ভদ্রলোক। নাম বোধ হয় কালিদাস বা কালীপ্রসাদ বা ওইরকম একটা কিছু। পদবী ঘোষাল।'

'স্টার বলছেন কেন?' বাবা জিগ্যেস করলেন।

'বলব না?' একেবারে পোল স্টার। স্টেডি। ইটারন্যাল। একশোর ওপর বয়স, কিন্তু দেখে বোঝার জো নেই।'

'বলেন কি! সেঞ্চুরিয়ন?' মামার হাঁয়ের মধ্যে চিবোন টোস্টের অনেকটা এখনো গেলা হয়নি।

'সেঞ্চুরি প্লাস টোয়েনটি-সিক্স। একশো ছাব্বিশ বছর বয়স ভদ্রলোকের। জন্ম এইটিন-ফিফ্‌টিসিক্স। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক এক বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এইটিন সিক্সটি-ওয়ান।'

আমাদের কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। গোপেনবাবু আবার চুমুক দিলেন চায়ে।

প্রায় এক মিনিট কথা বন্ধের পর ছোটদা প্রশ্ন করল, 'বয়সটা আপনি জানলেন কি করে? উনি নিজেই বলেছেন?'

'নিজে কি আর যেচে বলেছেন? অতি অমায়িক ভদ্রলোক। নিজে বলার লোকই নন। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল। দেখে মনে হবে আশি-বিরাশি। ওঁরই বাড়ির বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক মহিলাকে দেখলুম, পাকা চুল, চোখে সোনার চশমা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। কথাচ্ছলে শুধোলুম—"আপনার গিন্নীর এখানকার ক্লাইমেট সুট করছে ত?" ভদ্রলোক স্মিতহাস্য করে বললেন, "গিন্নী নয়, নাতবৌ।" আমি ত থ। বললুম, "কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার বয়সটা—?" "কত মনে হয়?" জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোক। বললুম, "দেখে ত মনে হয় আশি-টাশি।" আবার সেই মোলায়েম হাসি হেসে বললেন, "অ্যাড অ্যানাদার ফর্টি-সিক্স।" বুঝুন তাহলে। সোজা হিসেব।

এর পর ব্রেকফাস্টটা ঠিকমতো খাওয়া হল না। এমন খবরে খিদে মরে যায়। ভারতবর্ষের—না, শুধু ভারতবর্ষ কেন—খুব সম্ভবত সারা পৃথিবীর মধ্যে সব

চেয়ে দীর্ঘায়ু লোক এখানে এসে রয়েছেন, আমরা যখন রয়েছি তখনই রয়েছেন, এটা ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

'দেখে আসুন গিয়ে', বললেন গোপেনবাবু। 'এমন খবর ত চেপে রাখা যায় না, তাই বললুম দু'চার জনকে —সুধীরবাবুদের, সেন সাহেবকে, বালিগঞ্জ পার্কের মিঃ নেওটিয়াকে। সবাই গিয়ে দর্শন করে এসেছেন। আর দুটো দিন যাক না, দেখুন কী হয়। আসল স্টারের অ্যাট্র্যাকশনটা কোথায় সেটা বুঝতে পারবেন।'

'লোকটির স্বাস্থ্য কেমন?' মামা জিগ্যেস করলেন।

'সকাল বিকেল ডেইলি দুমাইল।'

'হাঁটেন?'

'হাঁটেন। লাঠি একটা নেন হাতে। তবে সে ত আমিও নিই। ভেবে দেখুন, আমার দ্বিগুণ বয়স!'

'ভদ্রলোকের আয়ুরেখাটা...'

মামার ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড।

'দেখবেন হাত', বললেন গোপেনবাবু, 'বললেই দেখাবেন।'

ছোনিদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।—'স্টোরি। এর চেয়ে ভালো স্টোরি হয় না। এ একেবারে স্কুপ।'

'তুই কি এখনই যাবি নাকি?' প্রশ্ন করলেন বাবা।

'একশো-ছাব্বিশ বয়স', বলল ছোনিদা। 'এরা কিভাবে মরে জান ত? এই আছে, এই নেই। ব্যারাম-ট্যারামের দরকার হয় না। সুতরাং, সাক্ষাৎকার যদি নিতে হয় ত এই বেলা। পরে দর্শনের হিড়িক পড়ে গেলে আর চান্স পাবো?'

'বোস্!' বাবা একটু ধমকের সুরেই বললেন। 'সবাই একসঙ্গে যাব। তোর ত একার প্রশ্ন নেই, আমাদের সকলেরই আছে। খাতা নিয়ে যাস, নোট করে নিবি।'

'বোগাস।'

কথাটা বলল ছোটদা। আর বলেই আবার দ্বিতীয়বার জোরের সঙ্গে বলল, 'বোগাস! ধাপ্পা। গুল।'

'মানে?' গোপেনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি কথাগুলো। 'দ্যাখো সুরঞ্জন, শেকসপীয়র পড়েছ ত? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্ন অ্যান্ড আর্থ জানা আছে ত? সব ব্যাপার বোগাস বলে উড়িয়ে দিলে চলে না।'

ছোটদা গলা খাক্‌রে নিল।

'আপনাকে একটা কথা বলছি গোপেনবাবু—আজকাল প্রমাণ হয়ে গেছে যে যারা একশো বছরের বেশি বয়স বলে ক্লেম করে তারা হয় মিথ্যেবাদী না হয় জংলী ভূত। রাশিয়ার হাই অলটিচিউডে একটা গ্রামে শোনা গিয়েছিল মেজরিটি নাকি একশোর বেশি বয়স, আর তারা এখনো ঘোড়া-টোড়া চড়ে। এই নিয়ে ইনভেসটিগেশন হয়। দেখা যায় এরা সব একেবারে প্রিমিটিভ। তাদের জন্মের কোনো রেকর্ডই নেই। পুরোন কথা জিগ্যেস করলে সব উলটো পালটা জবাব দেয়। নম্বুই-এর গাঁট পেরোন চাট্টিখানি কথা নয়। লঙ্গিভিটির একটা লিমিট আছে। নেচার মানুষকে সেই ভাবেই তৈরি করেছে। বার্নার্ড শ', বার্ট্রান্ড রাসেল, পি জি উডহাউস—কেউ পেঁছতে পারেননি একশো। যদুনাথ সরকার পারেননি। সেঞ্চুরি কি মুখের কথা? আর ইনি বলছেন একশো-ছাব্বিশ। হুঃ!'

'জোরো আগার নাম শুনেছিস?' খেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন মামা।

'না। কে জোরো আগা?'

'তুর্কীর লোক। কিম্বা ইরানের। ঠিক মনে নেই। থার্টি ফোর-থার্টি ফাইভের কথা। একশো চৌষট্টি বছরে মারা যায়। সারা বিশ্বের কাগজে বেরিয়েছিল মৃত্যু-সংবাদ।'

'বোগাস।'

ছোটদা মুখে যাই বলুক, কালী ঘোষালের বাড়ি যখন গেলাম আমরা, সে বোধ হয় অবিশ্বাসটাকে আরো পাকা করার জন্যই আমাদের সঙ্গে গেল। গোপেন-বাবুই নিয়ে গেলেন। বাবা বললেন, 'আপনি আলাপটা করিয়ে দিলে অনেক সহজ হবে। চেনা নেই শোনা নেই, কেবল একশো ছাব্বিশ বয়স বলে দেখা করতে যাচ্ছি, এটা যেন কেমন কেমন লাগে।' ছোনিদা অবিশ্যি সঙ্গে নোটবুক আর দুটো ডট পেন নিয়েছে। মা বললেন, 'আজ তোমরা আলাপটা সেরে এস। আমি এর পর দিন যাব।'

কালী ঘোষালের বাড়ির সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার, কাঠের চেয়ার, মোড়া আর টুলের বহর দেখে বুঝলাম সেখানে রেগুলার লোকজন আসতে শুরু করেছে। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা, কারণ গোপেনবাবু বললেন ওটাই বেস্ট টাইম। গোপেনবাবুর 'ঘোষাল সাহেব বাড়ি আছেন?' হাঁকের মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মন খালি বলছে একশো ছাব্বিশ—একশো ছাব্বিশ—একশো ছাব্বিশ—অথচ চেহারা দেখলে সত্যিই আশির বেশি মনে হয় না। ফরসা রং, বাঁ গালে একটা বেশ বড় আঁচিল, টিকোলো নাক, চোখে পরিষ্কার চাহনী, কানের দুপাশে দুগোছা পাকা চুল ছাড়া বাকি মাথায় চক্‌চকে টাক। এককালে দেখতে বোধহয় ভালোই ছিলেন, যদিও হাইট পাঁচ ফুট ছয়-সাতের বেশি নয়। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পাজামা, কট্‌কি চাদর, পায়ে সাদা কট্‌কি চটি। চামড়া যদি কুঁচকে থাকে ত চোখের দুপাশে আর থুতনির নিচে।

আলাপের ব্যাপারটা সারা হলে ভদ্রলোক আমাদের বসতে বললেন। ছোটদা থামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার মতলব করেছিল বোধহয়, বাবা 'রঞ্জু, বোস্ না' বলতে একটা টুলে বসে পড়ল। সে এখনো গম্ভীর।

'এভাবে আপনার বাড়ি চড়াও করাতে ভারী লজ্জিত বোধ করছি আমরা', বললেন বাবা, 'তবে বুঝতেই পারছেন, আপনার মতো এমন দীর্ঘজীবী মানুষ ত দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাই...'

ভদ্রলোক হেসে হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যাপোলোজাইজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। একবার যখন বয়সটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন লোকে আসবে সেটা ত স্বাভাবিক। বয়সটাই যে আমার বিশেষত্ব, ওটাই একমাত্র ডিস্টিংশন—সেটা কি আর বুঝি না? আর আপনারা এলেন কষ্ট করে, আপনাদের সাথে আলাপ হল, এ ত আনন্দের কথা।'

'তাহলে একটা কথা বলেই ফেলি', বললেন বাবা। 'একটা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন। আমার এই ভাইপোটি নাম শ্রীকান্ত চৌধুরী, হল সাংবাদিক। এর খুব শখ আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় সেটা ওর কাগজে ছাপায়। অবিশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি কিসের?' ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন। 'শেষ জীবনে যদি খানিকটা খ্যাতি আসে, সে ত আমারই ভাগ্য। গণ্ডগ্রামে কেটেছে সারাটা জীবন। তুলসীয়ার নাম শুনেছেন? শোনেননি। মুর্শিদাবাদে। রেলের কানেকশন নেই। বেলডাঙা জানেন ত? বেলডাঙায় নেমে সতের কিলোমিটার দক্ষিণে। তুলসীয়ায় জমিদারী ছিল আমাদের। সে সব ত আর নেই, তবে বাড়িটা আছে। তারই এক কোনায় পড়ে আছি। সেখানকার লোকে বলে যমের অরুচি। বলবেনাই বা কেন। গৃহিণী গত হয়েছেন বাহান্ন বছর আগে। ভাই বোন ছেলে মেয়ে কেউ নেই।

নাতি আছে একটি, ডাক্তারি করে, তারও আসার কথা ছিল; এক রুগীর এখন-তখন অবস্থা, তাই শেষ মুহূর্তে আসতে পারলে না। একাই আসতে পারতুম, চাকর সঙ্গে ছিল, নাত-বৌ দিলে না। সে এসেছে সঙ্গে। এই তিনদিনেই পুরো সংসার পেতে বসেছে। ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে সব।'

ডট পেনে আওয়াজ নেই। তবে আড়চোখে দেখছি ছেনিদা দাঁতে দাঁত চেপে ঝড়ের বেগে লিখে চলেছে। টেপরেকর্ডারটার ব্যাটারি খতম, সেটা টের পেয়েছে আসার দিন, রোববারে। তাই কলম ছাড়া গতি নেই। সঙ্গে একটা ধার করা পেনট্যাক্স ক্যামেরা আছে। কোনো একটা সময়ে সেটার সদ্ব্যবহার হবে নিশ্চয়ই। ছবি ছাড়া এ লেখা ছাপা হবে কি করে?

'কিছু মনে করবেন না', ফাঁক পেয়ে বললেন মামা, 'আমি আবার একটু পামিস্ট্রির চর্চা-টর্চা করি। বিলিতি মতে অবশ্য। তা, আপনার হাতখানা যদি একবার দেখতে দেন। শুধু একবারটি চোখ বুলোব।'

'দেখুন না।'

কালী ঘোষাল ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, মামা হাতটা ধরে তার উপর ঝুঁকে পড়ে মিনিট খানেক দেখে মাথা নেড়ে বললেন, 'ন্যাচারেলি। ন্যাচারেলি। আপনার বয়সের সঙ্গে তাল রেখে আয়ুরেখাকে বাড়তে গেলে সেটা হাত ছেড়ে কব্জিতে এসে নামবে। আসলে শতায়ু বা শতাধিক আয়ুর জন্য মানুষের হাতে কোনো প্রভিশন নেই। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

এবার বাবা বললেন, 'আপনার স্মরণশক্তি কি এখনো, মানে—?'

'মোটামুটি ভালোই আছে', বললেন কালী ঘোষাল।

'কলকাতায় কি আপনি একেবারেই আসেননি?' প্রশ্ন করল ছেনিদা।

'এসেছি বৈকি। পড়াশুনা ত হেয়ার স্কুল আর সংস্কৃত কলেজে। কর্ণ-ওয়ালিস স্ট্রীটে হস্টেলে থাকতুম।'

'ঘোড়ার ট্রাম—?'

'ঢের চড়িছি। দু' পয়সা ভাড়া ছিল লালদীঘি টু ভবানীপুর। রিকশা ছিল না তখন। পালকির একটা বড় স্ট্যান্ড ছিল শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। পালকি বেহারাদের স্ট্রাইক হয় একটা, সে কথাও মনে আছে। আজকাল যেমন রাস্তাঘাটে কাক-চড়ুই, তখন হাড়গিলে চরে বেড়াত কলকাতার রাস্তায়। বলত স্ক্যাভেঞ্জার বার্ড। আবর্জনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেত। প্রায় আমার কাঁধের হাইট, তবে একদম নিরীহ।'

'তখনকার কোনো বিখ্যাত পার্সোনালিটিকে মনে পড়ে?' ছেনিদাই চালিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন।

'বিখ্যাত মানে, রবীন্দ্রনাথকে পরে দেখিছি অনেক। আলাপ অবশ্যই ছিল না; আমি আর এমন একটা কে যে আলাপ থাকবে। তবে একবার তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছিলাম। কবিতা আবৃত্তি করলেন। হিন্দু মেলায়।'

'সে ত বিখ্যাত ঘটনা!' বললেন বাবা।

'বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিনি কখনো। একটানা কলকাতায় থাকলে হয়ত দেখা পেতুম। কিন্তু আমি কলেজের পাঠ শেষ করেই দেশে ফিরে যাই। তবে হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। সে এক ব্যাপার বটে। হেদোর পাশ দিয়ে হাঁটছি আমরা তিন বন্ধুতে, বিদ্যাসাগর আসছেন উলটো দিক থেকে। মাথায় ছাতা, পায়ে চটি,

কাঁধে চাদর। আমার চেয়েও মাথায় খাটো। ফুটপাথে কে জানি কলা খেয়ে ছোবড়া ফেলেছে, বিদ্যাসাগরের পা পড়তেই পপাত চ। আমরা তিনজন দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে তুললুম। হাতের ছাতা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়, সেটাও তুলে এনে দিলুম। ভদ্রলোক উঠে কী করলেন জানেন? এ জিনিস ওনার পক্ষেই সম্ভব। যে ছোবড়ায় আছাড় খেলেন সেটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কাছে ডাস্টবিন ছিল, তার মধ্যে ফেলে দিলেন।'

আমরা আরো আধ ঘণ্টা ছিলাম। তার মধ্যে চা এল আর তার সঙ্গে নির্ঘাত নাত-বৌয়ের তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ। শেষ কালে যখন বিদায় নিতে উঠলাম, ততক্ষণে ছেনিদা একটা টাট্‌কা নতুন নোটবুকের প্রায় অর্ধেক ভরিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে অবিশ্যি ছবিও তুলেছে খান দশেক। সেই ফিল্ম পার্শেল করে চলে গেল কলকাতায় ছেনিদার খবরের কাগজের আপিসে। সেই খানেই ছবি ডেভেলপিং প্রিণ্টিং হয়ে ভালো ছবি বাছাই করে কাগজে বেরোবে।

পাঁচ দিনের মধ্যে ছেনিদার লেখা ছবি সমেত কাগজে বেরিয়ে সে কাগজ আমাদের হাতে চলে এল। লেখার মাথায় বড় বড় হরফে হেডলাইন—'বিদ্যাসাগরের হাত ধরে তুলেছিলাম আমি'।

ছেনিদা 'স্কুপ' করল ঠিকই, আর তার ফলে আপিসে তার যে কদর বেড়ে যাবে তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর পরে আমরা থাকতে থাকতেই কলকাতার আরো সাতখানা দিশি-বিলিতি কাগজের সাংবাদিক এসে কালী ঘোষালের ইণ্টারভিউ নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা বলা হয়নি। ফিল্ম স্টার অংশুমান চ্যাটার্জি তার চেল্যাচামুণ্ডাদের নিয়ে মার্সেডিজ গাড়ি করে দশ দিনের ছুটি পাঁচ দিনে খতম করে কলকাতায় ফিরে গেছে। তার নাকি হঠাৎ শুটিং পড়ে যাওয়াতে এই ব্যবস্থা। শর্মি খুব একটা আপশোষ করল না, কারণ এই ফাঁকে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার কাজটা সে সেরে নিয়েছে। সত্যি বলতে কি, খাতা নিয়ে যখন অংশুমানের সঙ্গে দেখা করে, তখন 'তোমার নাম কী খুকী?' জিগ্যেস করাতে হিরোর উপর থেকে অন্তত সিকি ভাগ ভক্তি তার এমনিতেই চলে গিয়েছিল। তারপর বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে তার মন ভরে গেছে। বাবা বললেন, 'সে থাকতে একটা বুড়ো-হাবড়াকে নিয়ে এত মাতামাতি হচ্ছে এটা বোধ হয় স্টার বরদাস্ত করতে পারলেন না।'

আমরা ফিরে আসার আগের দিন রাত্রে কালী ঘোষাল আর তার নাত বৌ আমাদের বাড়িতে খেলেন। অল্পই খান ভদ্রলোক, তবে যেটুকু খান তৃপ্তি করে খান। 'জীবনে কখনো ধূমপান করিনি, তাছাড়া পরিমিত আহার, দুবেলা হাঁটা, এই সব কারণেই বোধহয় যমরাজ আমার দিকে এগোতে সাহস পাননি!'

'আপনার ফ্যামিলিতে আর কেউ খুব বেশিদিন বেঁচেছিলেন কি?' জিগ্যেস করলেন বাবা।

'তা বেঁচেছিলেন বৈকি। শতাধিক আয়ুর সৌভাগ্য আমার পিতামহ প্রপিতামহ দুজনেরই হয়েছিল। প্রপিতামহ তন্ত্রসাধনা করতেন। একশো তেরো বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, "গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর। আমার সময় এসেছে।" অথচ বাইরে থেকে ব্যাধির কোনো লক্ষণ নেই। চামড়া টান, দাঁত পড়েনি একটাও, চুলে যৎসামান্য পাক ধরেছে। যাই হোক, অন্তর্জলির

ব্যবস্থা হল। হরনাথ ঘোষাল শিবের নাম করতে করতে কোমর অবধি গঙ্গাজলে শোয়া অবস্থায় চক্ষু মুদলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। আমার বয়স তখন বেয়াল্লিশ। সে দৃশ্য ভুলব না কখনো।'

'রিমার্কেবল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মামা।

কলকাতায় ফেরার সাতদিন পরে ছোটদা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল হাতে একটা বাঁধানো মোটা বই নিয়ে। বই নয়, পত্রিকা। নাম 'বায়স্কোপ'। বলল নবরঙ্গ পত্রিকার এডিটর সীতেশ বাগচীর কাছে পঞ্চাশ টাকা জমা রেখে বইটা একদিনের জন্য বাড়িতে আনতে পেরেছে। দুটো পাতার মাঝখানে একটা বাসের টিকিট গোঁজা ছিল। সেই পাতায় খুলে বইটা আমার সামনে ফেলে দিল।

ডান দিকের পাতায় একটা বেশ বড় ছবি, যাকে বলে ফিল্মের 'স্টিল', চকচকে আর্ট পেপারে ছাপা। পৌরাণিক ছবির স্টিল। ফিল্মের নাম 'শবরী'। ছবির তলায় লেখা—'প্রতিমা মুভীটোনের নির্মীয়মাণ ছায়াচিত্র শবরী-তে শ্রীরামচন্দ্র ও শবরীর ভূমিকায় যথাক্রমে নবাগত কালীকিঙ্কর ঘোষাল ও কিরণশশী'।

'চেহারাটা মিলিয়ে দ্যাখ, স্টুপিড', বলল ছোড়দা।

দেখলাম মিলিয়ে। কিরণশশীর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা—অর্থাৎ মাঝারি হাইট, খালি গা বলে বোঝা যায় গায়ের রং ফরসা, টিকোলো নাক, আর ডান গালে বেশ একটা বড় আঁচিল। বয়স দেখে পঁচিশের বেশি বলে মনে হয় না।

আমার কেমন যেন বুকটা খালি-খালি লাগছে। জিগ্যেস করলাম, 'এটা কবেকার ছবি, ছোড়দা?'

'সেপাই মিউটিনির আটষট্টি বছর পরে। নাইনটীন টোয়েন্টি-ফোর। সাইলেন্ট ছবি। তার হিরো হচ্ছেন কালীকিঙ্কর ঘোষাল। এই প্রথম, আর এই শেষ ছবি। তিন মাস পরের সংখ্যায় ছবির সমালোচনা আছে। বলছে নবাগত নায়ক আগমন না করিলে কোনো ক্ষতি ছিল না। চিত্রাভিনেতা হিসাবে এঁর কোনো ভবিষ্যৎ নাই।'

'মানে, তাহলে ওঁর বয়স'—

'যা মনে হয় তাই। আশি-বিরাশি। চব্বিশ সালের এ ছবিতে যদি বছর পঁচিশ বয়স হয়, তাহলে হিসেব করে দ্যাখ ওর সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আসলে ওর বৌ। গোপেনবাবু প্রথমে যা ভেবেছিলেন তাই।'

'লোকটা তাহলে একেবারে—'

'বোগাস। ফোর-টোয়েন্টি। ভাবছিলাম কাগজে লিখে সব ফাঁস করে দিই, কিন্তু করব না। কারণ লোকটার ব্রেনটা শার্প আছে। সেটার তারিফ করতেই হয়। যখন বয়স ছিল তখন রাম-হড়কান হড়কেছে, কিন্তু শেষ বয়সে দেখিয়ে ত দিল—একটি মিথ্যে কথা বলে কী করে স্পটলাইটটা টপ স্টারের উপর থেকে টেনে এনে নিজের উপর ফেলতে হয়!'